বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৩৫৮

ভারতে-ইংরাজ

বা

ইংরাজ-রাজত্বের উপকারিতা।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত।

২৪৭৬

কলিকাতা।
৩৯নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীটস্থ
হাটখোলা দত্তবাটী হইতে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি-প্রেসে এন, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৮ সাল, বৈশাখ।

মূল্য ।০ চারি আনা।

ভূমিকা।

ভারতবাসী অশিষ্ট, অশান্ত বলিয়া কস্মিন্‌কালেও কুখ্যাতি ছিল না , ভারতের রাজভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ। ভারতের প্রজা নিরীহ, নিরুপদ্রব, অদ্যাপিও সে সুখ্যাতির অপচয় ঘটে নাই, যাহাতে আমাদিগের যুবকগণ অসৎ পথানুবর্ত্তী না হইয়া রাজভক্তিপরায়ণ হয়, এবং আমরা যে রাজার অশেষ অনুগ্রহে সুখস্বচ্ছন্দতায় নিরুপদ্রবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, রাজার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আমাদের যুবকগণের মনে যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার জন্য ইংরাজ রাজের কৃতোপকারগুলি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য "ভারতে ইংরাজ" নামধেয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। ইহা সর্ব্বাগ্রে সুপ্রসিদ্ধ "জন্মভূমি" নামক মাসিক-পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তৎকালে কয়েকখানি সংবাদ-পত্রে ইহার বিশেষ সুখ্যাতিলাভ ঘটে। কেহ কেহ এই প্রবন্ধগুলির একদেশদর্শিতার জন্য দুঃখও করেন। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ছিল, "ভারতে ইংরাজ" বা ইংরাজ রাজত্বের উপকারিতা। প্রবন্ধের নামানুসারে আমরা কেবল ইংরাজ রাজত্বের উপকারিতা একে একে আমাদের যুবকগণের মনে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

এক্ষণে আমরা রাজকর্তৃপক্ষীয় মহানুভবগণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এ দেশের মধ্যইংরাজি ও মধ্যবাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের পাঠ্যরূপে পুস্তকখানির অধ্যাপনা করিবার ব্যবস্থা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়।

কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে কলিকাতা জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে চির-রাজভক্ত "জন্মভূমি"সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই পুস্তক সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ে প্রকাশ না করিলে, ইহা সাধারণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইতে পারিত না।

কলিকাতা।
১৪।২ বিডন ষ্ট্রীট,
১১ মে ১৯১১ সাল।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

ব. সা. প. পু.
উপহৃত তাং ২৪-২-১৯

১৪৭৬

ভারতে ইংরাজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ রাজত্বের উপকারিতা।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দের ২৩ শে জুন পলাশীর সমরক্ষেত্রে ইংরাজের বিজয়বৈজয়ন্ত উড্ডীন হইলেই যে, ইংরাজ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান শাসনকর্তার হস্ত হইতে লর্ড কর্ণ

ওয়ালিশ এদেশের শাসনদণ্ড যে দিন হইতে গ্রহণ * করেন, সেই দিন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে ইংরাজ রাজত্ব গণনা করিতে হইবে। যদিও ওয়ারেণ-হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অপরাধ সম্পর্কীয় উচ্চ বিচারালয় এবং তাহার অধীন জেলায় জেলায় ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তথাপি সেই সকল আদালতে মুসলমান বিচারপতিগণ বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এজন্য ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হইতেই ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ ধরিতে হইবে। সেই সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত ইংরাজ-রাজত্বে যে অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে প্রসঙ্গক্রমে অতীতের কথা না বলিলে, সকল বিষয় পরিস্ফুট হইবে না বলিয়া, তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে। উপকার এক বিষয়ে নহে,—নানা বিষয়ে হইয়াছে। অতএব ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

অশনবসন। সর্ব্বাগ্রে অশনবসনাদির কথা বলা যাউক। এদেশে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে আমাদের পিতৃপুরুষেরা দু-সন্ধ্যা দু-বেলা দুই মুষ্টি অন্ন এবং লজ্জানিবারণোপযোগী পরিচ্ছদেই সন্তুষ্ট থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মোটা চাউলের ভাত এবং তাহার সহিত কচু, কাঁচাকলা, বেগুন পটোলের ব্যঞ্জন তাঁহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। তখন এ দেশে গোল আলু, কপি, শালগম প্রভৃতির চাস হইত না। দিবসের অষ্টম ভাগে শাকান্ন ভোজনে অঋণী অপ্রবাসী হইতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেন।‡ বড় বড় গৃহস্থগণ মুড়িগুড়, বাতাসা-তেই প্রাতরাশ মিটাইতেন,—রাজারাজড়া, আমীরওমরায়েরাই কালিয়া পোলাও

* But in 1790 Lord Cornwallis attacked this last strong-hold of Mussalman misrule. He stripped the Nwab of his grossly abused judicial authority, contemptuously leaving his allowances as they then stood, established a Supreme criminal court in Calcutta, presided over by the Governor General and council and four courts of circuit with two experienced English officers at the head of each.

W. W. Hunter's Annals of Rural Bengal. Page 330.

‡ দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকম্পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥ মহাভারত।

কোপ্তা কাবাব খাইতেন, সাধারণ গৃহস্থগৃহে সেই সকল উপাদেয় খাদ্যের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যাইত না। আজিকালি মুটে মজুরেও সাধ করিয়া তাহা খাইয়া থাকে। মিষ্টান্নের ত কথাই নাই, মিঠাই মণ্ডা অন্ত্যজেও খাইতে পায়।

কেহ হয় ত বলিতে পারেন,—"আজিকালি খাদ্যের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইতেছে।" সে দোষ আমাদের আপনাদের, ইংরাজ-রাজ খাদ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য আইন করিয়াছেন, আদালত রাখিয়াছেন, অপরাধীকে দণ্ড দিতেছেন। আমরা আপনাদের বেশী লাভের জন্য সর্ষপের সহিত রেড়ি, শেয়ালকাঁটা, করঞ্জা প্রভৃতি কুদ্রব্য মিশাইয়া তৈল প্রস্তুত করিতেছি, ঘৃতে মিশাইবার জন্য চর্ব্বির কারখানা খুলিয়াছি। খাদ্যসুখ মানব জীবনের একটা প্রধান ভোগ। খাদ্যের জন্য সকলে বিব্রত। অতএব সেই খাদ্যের কষ্ট মিটাইতে পারিলে একটা মহৎ অভাব মিটিয়া যায়।

পূর্ব্বে এ দেশের ঘরে ঘরে চরকা চলিত, গৃহিণীরা সূতা কাটিয়া তন্তুবায়কে মজুরি দিয়া কাপড় বুনাইতেন. সেই কাপড়ই তাঁহাদের লজ্জা নিবারণ করিত মাত্র, তদ্দ্বারা সভ্যতা রক্ষা পাইত না। সূক্ষ্ম সূতা সকলে কাটিতে পারিতেন না, মোটা সূতাই সচরাচর প্রস্তুত হইত। এজন্য সাধারণতঃ সকল কেই মোটা কাপড় পরিতে হইত। সূক্ষ্ম বস্ত্র যে তখন প্রস্তুত হইত না এমন নহে, দুর্মূল্যতা হেতু বড় মানুষেই তাহা পরিতে পারিতেন। সেই রূপ সূতার কাপড়েই শীত নিবারণ করিতে হইত। ধনবানেরাই শাল জামিয়ার গায়ে দিতেন, বিশেষ সম্পন্ন গৃহস্থের মধ্যে বনাতের চলন ছিল মাত্র। সাধারণ ব্যক্তিরা পশমী বস্ত্র শীত নিবারণের জন্য ব্যবহার করিতে পারিত না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কোট কামিজের নামও জানিতেন না। বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি না হইলে তাঁহার গায়ে অঙ্গরাখা বা বেনিয়ান উঠিত না। বনাত ও শাল জামিয়ারে ময়লা ধরিবে বলিয়া, অনেককে তাহার নীচে উড়ানি ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। এখন সকলেই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেছে, কামিজ কোর্ত্তায় চব্বিশ ঘণ্টা অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেছে, ইচ্ছা হইলেই হ্যাট, কোট. প্যান্টালুন পরিয়া চোখে চশমা লাগাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত ভাবিয়া সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছে। শীতকালে শাল জামিয়ার প্রভৃতি নানা রঙ্গের, নানা নামের শীতবস্ত্র দরিদ্র জনেও ব্যবহার করিতেছে, পরিচ্ছদে ভদ্রাভদ্র চিনিয়া লওয়া যায় না। পঞ্চাশ বৎসরের কথা বলিতেছি,—তখন আমাদের বাল্যাবস্থা, স্কুল পাঠশালায় লেখাপড়া করি, দেখিয়াছি, বাগ্দী হাড়ি প্রভৃতি নীচ জাতীয়েরা কৌপিন ধারণ করিত, তাহার জন্য তাহারা

ভদ্র লোকের বাড়ীতে ছিন্ন বস্ত্র ভিক্ষা করিতে আসিত। আজি হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াও, কুত্রাপি কাহাকেও বস্ত্রাভাবে চীর পরিহিত দেখিবে না; সকলেরই সূক্ষ্ম বস্ত্র। দরিদ্র লোকেরাও হাটে বাজারে মেলা মহোৎসবে কুটুম্বালয়ে যাইবার সময় কোট কামিজ গায়ে দেয়, সে কালে ভদ্র লোকের মধ্যে যে ছাতা জুতার সাধারণ প্রচলন ছিল না, আজি তাহারা সেই ছাতা, জুতা ব্যবহার করিতেছে। এ সকল সভ্যতার লক্ষণ সন্দেহ নাই; অর্থ না হইলে সভ্যতা রক্ষা পায় না, দরিদ্র লোকের হাতে অর্থ জুটিতেছে, তাই তাহারা সভ্যতার জন্ত লালায়িত। যাহাদের ভাল না খাইলে, ভাল না পরিলে নিন্দা নাই, বরং ক্ষুধায় কাতর হইলে সহানুভূতি পায়, খাবার জোটে, এরূপস্থলে তাহারা ভাল খাবারটী খুজিয়া খায়, ভাল দেখিয়া পরিধেয় ক্রয় করে, তবে তাহাদের অর্থসাচ্ছল্য বই কি, বলিতে পারা যায়। বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি জেলার অরণ্যবাসী সাঁওতাল, কোল, ভীল, বাউরী প্রভৃতি নরনারীরা কলিকাতা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে মজুরী করিতে আসিবার সময় চীর ধারণ করিয়া আইসে, আর সম্বৎসর কাল পরে দেশে ফিরিবার সময় সাতসিকা দুইটাকা মূল্যের কাপড় কিনিয়া লইয়া যায়।

ভূষণ। তখনকার ভদ্র মহিলাগণ রূপার বালা, রূপার পৈঁচা, রূপার তাবিজ, সোণার নথ, সোণার পাশা, সোণার কণ্ঠমালা পাইলেই আপনাদিগকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিতেন, ঘরবুনান কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন কলের সৌখিন কাপড়ের মধ্যে কেবল থানের আমদানি ছিল, তখন সেই থানের কাপড়ে পাড় লাগিয়া এ দেশের লোকে সাটী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই তাঁহারা সূক্ষ্মবস্ত্রের আদর করিতে আরম্ভ করেন। এখন সোণার চুড়ি সোণার বালা সোণার তাড়, সোণার তাবিজ, সোণার ফুল, সোণার নেক্‌লেশ ও মুকুটে এবং বেনারসী, বোম্বাই, পার্শীশাড়ী, সেমিজ, বডি প্রভৃতি বসনভূষণে গৌরবান্বিত, ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে যাহাদের পিত্তল কাঁসার গহনা ছিল, আর্থিক উন্নতিপ্রভাবে আজি তাহাদের বিবাহেও সোণার গহনার কর্দ্দ হইতেছে।

বাসগৃহ। সে কালের সর্ব্বত্র দেবালয় ভিন্ন প্রায়ই ইষ্টকালয় দেখা যাইত না। বড় বড় জমিদারেরাও মাটীর ঘরে বাস করিতেন,—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথায় কাজ কি, দরিদ্র লোকেরা চাল্লা বাঁধিয়া তাহাতে দিন কাটাইত। তাহাদের মধ্যে যাহাদের সংসার একটু সচ্ছল ছিল, তাহারা দেওয়াল-দেওয়া ঘরে বাস করিলেও তাহাতে

কপাট জানালা থাকিত না। মজুরি ব্যতীত তাহাদের জীবিকান্তর ছিল না, মাসিক বেতন ছয় আনা হইতে আট আনা, আর খোরাকী বাবত যৎকিঞ্চিৎ মিলিত। এখন তাহা তাহাদের দৈনিক বেতন। জমিদার, ধনী মহাজনদিগের ত কথাই নাই, সাধারণ গৃহস্থের এখন মাটীর ঘরে বাস করিবার ইচ্ছা হয় না, কিছু সঙ্গতি হইলেই ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিতেছে। দরিদ্রলোকের চালাঘর ঘুচিয়াছে, তাহারা দেওয়াল-দেওয়া ঘরে বাস করে, তাহাতে দরজা জানালা বসায়। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পর এদেশের একতৃতীয়াংশ জমি পতিত হইয়া যায়, দশশালা বন্দোবস্তের সময় সকল মহলেই খামার গোচর অনেক অনাবাদী জমি ছিল। এখন দরিদ্র লোকেরা অনেকেই কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা পরের কাজ করে না বলিয়া মজুর কমিয়া গিয়াছে, এজন্য সকল গ্রামেই সাঁওতাল, কোল, বাউরী প্রভৃতির প্রয়োজন হইতেছে। অনাবাদী জমি এখন কোন গ্রামেই নাই। প্রজার অভাবে জমি পড়িয়া রহিল এমন কথা হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে কদাচ শুনিতে পাওয়া যায়।

পানভোজন পাত্রাদি :—

তখন আমাদের ভদ্রলোকের বাড়ীতে কি ছিল? খেজুর পাতার চেটার উপর মাদুর বিছাইয়াই সকলকে শয়ন করিতে হইত, শীত নিবারণের জন্য সকল বাড়ীতেই লেপ ছিল বটে, কিন্তু কম্বার আদর যায় নাই। কর্ম্মকাজ উপলক্ষে পরের বাড়ী হইতে সপ, মাদুর, শতরঞ্চ চাহিয়া আনিতে হইত, ভোজনপাত্র ছিল— বালেশ্বরের পাথর ও খোরা, পানপাত্র পিতলের ঘটী। কাঁসার থালা, গেলাস, বাটী সকল বাড়ীতে মিলিত না। সকল গৃহস্থের বাক্স, সিন্দুক ছিল না, বেতের পেঁড়াই সম্বল। কেহ দশ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিলে, চোর ডাকাইতের ভয়ে মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিত। তখনকারকালে বড় বড় গৃহস্থগৃহে মাটীর প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিত। এখন দরিদ্রলোকের ঘরেও মাদুর শতরঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীষ্মকালে তাহারাও মশারি খাটাইয়া শয়ন করে,—তাহাদের গৃহেও পিতল-কাঁসার পান ও ভোজনপাত্র হইয়াছে। তাহারাও টীনের বাক্স, পেঁটরা ব্যবহার করে, সিন্দুক বাক্স মধ্যে টাকা পয়সা রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যায়,—কাহার কাহার বাড়ীতে ধানের মরাই বাঁধা। ধনীর গৃহে লোহার সিন্দুক। এখন অশনবসনে ভোজনে, শয়নে, উপবেশনে সকলেরই সুখ। সকলের ঘরেই চিমনীর ভিতর আলো জ্বলে। বিবাহ মহোৎসবে, দেবতার পূজা অর্চ্চনা উপলক্ষে ডুমচিমনীর

আলোতে অন্ধকারময়ী নিশা দিবসের ন্যায় হইয়া থাকে।

ঘর সাজাইবার জন্ত কত রকমের চিত্রপট হইয়াছে,—দেবদেবীর চিত্র, দেবালয়ের চিত্র, পাহাড় পর্ব্বত, বন উপবনের চিত্র। কাজকর্ম্ম করিয়া সকলেই আপন গৃহে আসিয়া জালা যন্ত্রণা জুড়ায়,—এখন তাহার কত উপায় হইয়াছে। সে কালে আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষা সহজে হইত না, দীর্ঘকাল পরে তাঁহার আকার অবয়ব কেমন ছিল, বহুকষ্টে তাহা স্মরণ করিতে হইত, এখন চারিটী আনা হইতে শত সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত খরচ করিয়া তাঁহার ফটো বা অয়েল পেণ্টিং রাখিয়া দিলে কতকাল তাঁহাকে জীবিতের ন্যায় দেখিতে এবং ফনোগ্রাফের রেকর্ডে তুলিয়া দিলে, কতকাল তাঁহার কণ্ঠস্বর অবিকৃতভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের বলে কি সুখের দিনই আসিয়াছে। ইংরাজ তাহার মূল নয় কি? ইংরাজ রাজত্বেরই এই সকল ঐশ্বর্য্য। ইংরাজের কৃপায় তাহা আমাদের ভোগে আসিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবিকা। সেকালে ব্রাহ্মণ, বৈদ্যকায়স্থ, কামারকুমার, তিলিতামলী প্রভৃতি অনেকেরই জাতীয় বৃত্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না, চাসের অনুষ্ঠান করিতে হইত, কেবলমাত্র জাতীয় বৃত্তি দ্বারা অতি অল্প লোকেরই সুখে সংসার চলিত। চাকরীর মধ্যে জমিদারের গমস্তাগিরি, নায়েবী, খাতাঞ্চীগিরি, আর কারবারের মুহুরীগিরি, তাহাতে কয়জন লোকেরই বা দিনপাত হইত? ঊর্দ্ধ সংখ্যা শতকরা চারি পাঁচজন মাত্র, ইহার অধিক কোনমতে নহে। বেকার লোকের সংখ্যা বেশী ছিল, পরিবার মধ্যে দুই একজন উপায়ক্ষম থাকিত, অপর সকলে—কেহ পুত্রের অন্নে, কেহ অগ্রজের বা অনুজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাস পাশা চালিতেন, শতরঞ্চের বল টিপিতেন, আত্মীয়স্বজনের উপর নির্ভর বেশী ছিল। এখন জীবিকার পথ কেমন উন্মুক্ত, কত প্রশস্ত! শিক্ষিতের সংখ্যা যেমন বেশী হইয়াছে, চাকরীর সংখ্যাও তেমনি বাড়িয়াছে। সরকারী আপিশ আদালতে

সওদাগরদিগের হাউসে কত কেরাণী, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পুলিশে, পোষ্ট-আপিশে কত লোক কাজ করিতেছে; তদ্ব্যতীত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী, মুন্সেফী, সবজজিয়তি, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটী, জজিয়তি, হাইকোর্টের জজিয়তি প্রভৃতি বড় বড় রাজকার্য্যে, বাঙ্গালীর অধিকার জন্মিয়াছে। কোন বিভাগে দেশীয় লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ নাই। কোন পদেই সুযোগ্য বঙ্গবাসীর বসিবার আপত্তি দেখা যায় না। ইংরাজ অনুগ্রহে বাঙ্গালী অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কলকারখানায় কত কুলির অন্ন সংস্থান হইয়াছে। সহরে মফস্বলে সাধারণ শ্রামিকের মাসিক বেতন আট টাকার নীচে নাই। যে কেহ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কাজ করিবে, তাহারই উপার্জ্জন হইবে। কাহাকেও আর বসিয়া থাকিতে হইবে না, এরূপ কাল আসিয়াছে। সকলেরই মনে রাজভক্তি জন্মিয়াছে, এবং অর্জ্জনস্পৃহা বলবতী হইয়াছে। পিতা আর পুত্রের ধনে বসিয়া খাইতে প্রস্তুত নহেন। ষাট বৎসরের বৃদ্ধও যুবার ন্যায় খাটিতে প্রস্তুত। ভদ্রসন্তানেরা আর্থিক উন্নতি করিতে শিখিয়াছে, তাহারা মূর্খ হইলেও দুষ্ক্রিয়াসক্ত নহে, কলে নলি পাকাইয়া ১৫৷২০ টাকা উপায় করে, তথাপি চুরি ডাকাতি করে না। অর্থ যেন অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাঁকুড়া মানভূম প্রভৃতি জেলা হইতে কুলি কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়া যাইতেছে। ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে। দেশের এই সমৃদ্ধি ইংরাজ রাজত্বের গুণে। যাঁহারা সে কালের সুলভতা স্মরণ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার অভ্যাস ভুলিতে পারেন না, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, সেকাল অপেক্ষা একালের সুখ স্বচ্ছন্দতা কত বেশী হইয়াছে। যেমন সুলভতা ঘুচিয়াছে, তেমনি দুর্ম্মূল্যতার জন্য অভাব নাই। দেশে মুদ্রা সুলভ হইয়াছে। তখনকার কালে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্য থাকিলেও টাকা পয়সা এতাধিক ছিল না, অর্থনৈতিকেরা আমাদের অপেক্ষা ইহা সুন্দররূপে বুঝাইতে পারিবেন। তবে আমরা মোটামুটি এই বুঝিতে পারি যে, বিগত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাতে সম্বৎসর টাকায় দশসের চাউল বিকাইয়াছিল, কেবল তিন চারিদিন ছয়সের বিকায় বলিয়া চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছিল, এখন ৬৷৭ টাকা মন চাউল বিকাইতেছে, তাহার জন্য কাহাকেও উপবাসী থাকিতে দেখা যায় না। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, টাকা শস্তা হইয়া দুর্ম্মূল্যতার ত্রুটি মিটাইয়াছে, এখন যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে অলসেরই অভাব, কর্ম্মক্ষম শ্রমশীল ব্যক্তিদের সুখভোগের মহা সুযোগ ঘটিয়াছে। সমাজও

তাহাই চায়। অন্ধ, খঞ্জ, ব্যক্তিরাই অসমর্থতা নিবন্ধন দয়ার পাত্র, তদ্ব্যতীত যাঁহারা কাজকর্ম্ম না করিয়া অন্যের গলগ্রহ হয়, তাঁহাদিগকে সমাজের কণ্টক বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সুখশান্তি। অতিপ্রাচীনকালেও এদেশে সুখশান্তি বিরাজ করিত। মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এদেশবাসীরা মামলা মোকর্দ্দমা প্রিয় ছিল না, দেনা পাওনার জন্য খতপত্র সাক্ষ্য সাবুদের প্রয়োজন হইত না। চুরি ডাকাতি ছিল না, বাড়ী ঘর খোলা পড়িয়া থাকিত।* কিন্তু যৎকালে ইংরাজ রাজ এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তৎকালে শান্তিরক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। বড় বড় নগরেই কেবল নবাব সরকারের বেতনভুক এক এক জন ফৌজদার $ অপরাধ সম্পর্কীয় ছোট ছোট মোকর্দ্দমার বিচার এবং কোতোয়াল ফৌজদারের অধীনে শান্তিরক্ষার কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। মফস্বলস্থ পল্লীগ্রামগুলির শান্তিরক্ষার ভার জমিদারদিগের হাতে ছিল, তাঁহারা আপনাপন জমিদারীর মধ্যে প্রজা ও পথিকগণের ধনমানপ্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন।॥ নবাব সরকারের নিযুক্ত কাজী বিচার করিতেন।

* The Simplicity of their laws and their contracts is proved by the fact that they seldom go to law. They have no suits about pledge and deposits or do they require either seals or witnesses, but make their deposits and confide in each other. Their houses and property they generally leave unguarded, Ancient Inidia as described by Megasthenes A.W Mc, Crindale.

$ The Faujdar or officer of Police and Judge of all crimes not capital.

Introduction to the Regulations of the Bengal Code by C. D. Field M. A ; L. L. D

॥ In villages again and throughout the country it is well known that each Zummeendar was held responsible for the police ; that is, for the safety of person and property within his Zum meendaree. This was an essential conditions of his tenure. His

পূর্ব্বে জমিদারেরা আপনাদের বাসসন্নিধানে কতকগুলি করিয়া চুয়াড়কে বসাইতেন, চুয়াড় নীচ জাতীয় লোক। তাহাদের উপর এক এক জন উচ্চ জাতীয় লোক কর্ত্তৃত্ব করিতেন।* এইরূপ চুয়াড়সন্নিবিষ্ট স্থানগুলির নাম ছিল থানা"। থানায় যিনি কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তাঁহার নাম ছিল "থানাদার"। তাঁহার অধীন চুয়াড়দিগকে পাইক বলা হইত। কোন কোন জায়গায় থানাদার বেতন স্বরূপ চাকরাণ জমি পাইতেন। এরূপ স্থলে তাঁহার অধীন পাইকেরাও চাকরাণ জমি ভোগ করিত আবার কোন জায়গায় থানাদার নগদ টাকায় বেতন পাইতেন। তাঁহাদের পাইকেরাও নগদ টাকায় বেতন পাইত; এই সকল থানা ব্যতীত থানাদারের অধীনে বড় বড় গ্রামে ফাঁড়িদার থাকিত।

এই সকল লোক জমিদারের খাজানা আদায়ে সাহায্য করিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ঘর ঘর যাইয়া তাগাদা করিত, বাকীদার প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিত, এবং পলাইয়া যাইতে না পারে তাহাও দেখিত।* সৎ জমিদারের অধীনে থাকিয়া থানাদারেরা প্রধানতঃ রাজস্ব সংগ্রহের কাজই করিত, জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য ব্যতীত তাহাদের আর কোন কাজ ছিল না। যে সকল জমিদারের এলাকা দিয়া সরকারী খাজনা যাইত জমিদার তাহার জন্য দায়ী থাকিতেন, কাজেই থানাদারও সেই খাজানার জন্য জমিদারের নিকট দায়ী থাকিত বলিয়া তাহারা অংশতঃ পুলিশের কাজ করিত। তজ্জন্য অজ্ঞান লোকে তাহাদিগকে সাধারণের সম্পত্তিরক্ষার জন্যও দায়ী বলিয়া জানিত। যখন এই সকল পুলিশের সৃষ্টি হয়, তখন তাহাদিগকে তাহাই করিতে হইত, কিন্তু পরিণামে কেবল

lands were granted to them subject to [illegible] and there were besides allotments of land set apart for the maintenance of a regular police.

Galloway's observations on the Law and Constitution of India page 434.

* Besides the establishment at the sectional head quarters one or more subordinates were stationed in each important village to assist in collecting the rents, to distrain the goods of defaulters, and to see that the Ryots did not desert their lands.

তাহারা সরকারী খাজনা ও জিনিষপত্র যেপাজাভই করিত। খৃঃ ১৭৯০, অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবাবের উপরই শান্তিরক্ষা ও অপরাধসম্পর্কীয় বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল, কিন্তু সুশৃঙ্খলতার সহিত কার্য্য হইত না।* কাজেই অনেক বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিয়াছিল। চৌকিদার, কাঁড়িদার, থানাদার প্রভৃতি শান্তিরক্ষক যে কেহ ছিল, তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল বলিয়া দস্যু তস্করগণের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিতে পারিত না; চুরি ডাকাতির সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছিল, তস্কর গণ সকলেরই উপর অত্যাচার করিত।

পূর্ব্বে প্রজার ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। ঘরে চোর ডাকাতের ভয়, পথে ঘাটে ঠেঙ্গাড়ে ফাঁসুড়ের ভয়। নানাস্থানে চোর ডাকাইত, দস্যু ঠগ, লেঠেড়া ফাঁসুড়ে প্রভৃতি নানা রকমে পথে ঘাটে যে কত লোকের ধনপ্রাণ নষ্ট করিত তাহা বলা যায় না। সর্ব্বত্রই তাহাদের ভয়ে লোক সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। সেকালে এতাধিক হাট বাজার ছিল না। দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইতে হইলে পথিকদিগকে প্রায়ই পথে রাত্রি যাপন করিতে হইত। বিশেষ পরিচয় ব্যতীত কোন গৃহস্থের অতিথি হইলে পথিকদিগকে প্রায়ই প্রাণ হারাইতে হইত। ঠগেরা সায়ংকালে গ্রামপ্রান্তে উপবিষ্ট থাকিয়া পথিকের অপেক্ষা করিত। দৈবক্রমে কাহাকেও পাইলে তাহাকে আদর যত্নপূর্ব্বক আপন বাড়ীতে আনিয়া পরম আত্মীয়ের ন্যায় আহারাদি করাইয়া, সুখশয্যা রচনা করিয়া তাহাতে শয়ন করাইত, তাহার নিদ্রাবেশ হইলেই গলা চাপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিত এবং রাত্রিমধ্যেই শবদেহ গ্রামান্তরে ফেলিয়া দিয়া আসিত। এই সব তো গেল পথে ধনপ্রাণ হারাইবার কথা। গৃহস্থ রাত্রিকালে গৃহমধ্যে স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় বাড়ীতে ডাকাত পড়িল—দ্বার জানালা ভাঙ্গিল, গৃহস্বামী ও গৃহিণীর উপর অত্যাচার

* Until 1790 the Nwab retained the style and the responsibility of Chief Magistrate, He left the duties wholly unperformed. Between 1765 and 1769, he did not even pretend to do what he had promised, the regular course of justice was at a stand; but every man exercised it who had the power of compelling others to submit to his decision.

W. W. Hunter's Annals of Rural Bengal page 328.

আরম্ভ করিত, সে কালে সকলের ঘরে সিন্দুক,বাক্স ছিল না গুপ্তধন মাটির নীচে পোঁতা থাকিত, যতক্ষণ তাহারা তাহা বাহির করিয়া না দিত, ততক্ষণ তাহাদের উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন হইত।

এই সকল ভয়ানক ব্যাপার অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজের সুগোচর হয় নাই। ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের কেহ কেহ শুনিলেও তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই,পরে যখন ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেন্যাণ্ট মনসেল সাহেব ঠগির হাতে প্রাণ হারাইলেন, সরকার বাহাদুরের সৈনিক বিভাগের কতকগুলি সিপাহী ছুটি লইয়া বাড়ী যাইবার ও কতকগুলি ছুট হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দস্যু হস্তে প্রাণ হারাইল, ডাক্তার সেরউড সাহেব মান্দ্রাজের লিটারারী জর্ণাল নামক সাময়িক পত্রে খৃঃ ১৮১৬ অব্দে ঠগিবিবরণ প্রকাশিত করিলে তাহা বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সুগোচর হয়। তখন তাঁহারা এদেশে অশান্তির কথা বিশ্বাস করেন; অতঃপর অনুসন্ধানের অনুষ্ঠানও হইতে থাকে, বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারী ঠগের অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হয়েন। কর্ণেল স্লিমান, মেজর বার্থউড, কাপ্তেন রেনল্ডস ও হেনলী প্রভৃতি সাহেবেরা ঠগি নিবারণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; শত শত ঠগ গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হইল। তজ্জন্য খৃঃ ১৮৩৬ অব্দে ৩০ আইন জারি হইল। ঠগদিগের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া গোয়েন্দা করা হইল। তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের তাম্বুর নিকটে, ফকিরের আস্তানায়, সন্ন্যাসীর আশ্রমে দেবালয় ও পান্থশালায়, নদীকূলে, বৃক্ষমূলে, পুষ্করিণীর জলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, যেখানে সেখানে নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ বাহির করিয়া দিতে লাগিল, এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া সকলকেই স্তম্ভিত হইতে হইল। খৃঃ ১৮৩৭ অব্দে ঠগি নিবারণ জন্য ৮ আইন জারি করা হইল, শত শত ঠগ দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসন ও দীর্ঘ কালের জন্য কারাবাস দণ্ড পাইল। খৃঃ ১৮৬৩ অব্দে পুলিশ আইন ও তৎপর বৎসর ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন প্রচলিত হইল। খৃঃ ১৮ ৪ অব্দে কর্ণেল হার্ব্বি বঙ্গদেশের ঠগী ও ডাকাতি বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জে, এইচ, রাইলি সাহেব তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়া দলে দলে ঠগ ও ডাকাত গ্রেপ্তার করিতে লাগিলেন। দুষ্টলোকেরা দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডিত ও দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হওয়ায় দেশের ঠগ ও ডাকাতের সংখ্যা কমিয়া গেল, অশান্তি দূর হইল, এবং ইংরাজানুগ্রহে শান্তি সংস্থাপিত হইল।

ইংরাজ রাজত্বে এ দেশের সর্ব্বত্র পথঘাট সুগম। গ্রাম্য পথ, রাস্তা, গ্রাম

হইতে গ্রামান্তরে যাইবার রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। আর কাহাকেও আইল পথে প্রায় চলিতে হয় না। পূর্ব্বের ন্যায় চোর ডাকাতের ভয় নাই। গ্রামে গ্রামে চৌকিদার, কনষ্টেবল পাহারা বেড়াইতেছে। যাহারই উপর একটু সন্দেহ হইতেছে, তাহার জীবিকানির্ব্বাহের সদুপায়জনক উপায় নাই, সচ্চরিত্রে থাকিবার জন্য তাহারই নিকট জামিন লওয়া হইতেছে, জামিন দিতে না পারিলে তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইতেছে। বদমাশেরা সদা সন্ত্রস্ত,— পাপকার্য্য করিতে কেহই সাহসী নহে।

ইংরাজ আমলে সকল দুরাচার ঠগ, দস্যুর অত্যাচার, উৎপীড়ন দূর হইয়াছে। অতএব কাহার কল্যাণে সে সকল ভয় দূর হইয়াছে? কাহার চেষ্টা যত্নে, কাহার উৎসাহ উদ্যমে আজিকালি এ দেশের পথঘাট নিরাপদ ও নিরুপদ্রব হইয়াছে। আজি একজন বালকেও নির্ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে, গৃহস্থ আপন গৃহে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারিতেছে দস্যুগণ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সাহসী নহে। বাজারে একজন লক্ষপতিও যেমন একজন কৌপিনধারীও তেমন। রাজার নিকট ধনীনির্ধন সকলেই সমান, তুলাদণ্ডে ন্যায়ের ওজন হইতেছে। জমিদার আপনার ন্যায্য খাজানা পাইবার জন্য প্রজার উপর জুলুম করিতে পারিতেছেন না। বাকী খাজানা আদায়ের জন্য তাঁহাকে আদালতের আশ্রয় লইতে হয়। রাজা আপনার রাজধর্ম্ম পালন করিতেছেন, প্রজারাও রাজার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। উভয়পক্ষের কাহারও কোন ত্রুটী নাই। ইংরাজ-রাজত্বে যে প্রজার সুখসমৃদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা ইংরাজের সুশাসন গুণে। তজ্জন্য আমাদিগকে পুরুষানুক্রমে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। উপকারীর উপকার স্বীকার না করা মহাপাপ। হিন্দু কস্মিনকালে কৃতঘ্ন নহে, চিরদিন রাজভক্ত। প্রস্তাবান্তরে বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মজ্ঞান ও আত্মসম্মান। আজি আমরা আত্মাভিমানে স্ফীত, আত্মগরিমায় গর্ব্বিত, জগদারাধ্য আর্য্যগণের বংশধর বলিয়া সদর্পে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের মুখে কেহ এরূপ কথা শুনিয়াছেন কি, আমাদের মধ্যে কয় জনই বা তাহা ভালরকম জানিতেন, বা বুঝিতেন. কয় জনেরই বা তাহা জানিবার ও বুঝিবার শক্তিসামর্থ্য ছিল। দশ বিশখানা গ্রামের মধ্যে দুই একজন অধ্যাপক সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন মাত্র, তাঁহারা শর্করাবাহী ছিলেন, শর্করার স্বাদ গ্রহণের ততটা চেষ্টাযত্ন করিতেন না। সাধারণ লোক ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিল, তাহাদের মনে সেই সকল বিষয়ের আলোচনার আবশ্যকতা স্থান ছিল না। আমাদের গোত্রপতি প্রাচীন ঋষিগণের অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানগবেষণার গৌরব করিতে এতদিন কয়জন শিক্ষা করিয়াছিল, কয় জনই বা তাহা চিন্তা করিবার সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিত, আমরা যে একটা উচ্চজাতি, জগতের জাতিতালিকায় আমাদেরযে একটা স্থান আছে, তাহাই বা কয়জন বুঝিত? সেইসকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা একবারে ছিল না, সুতরাং কেমন করিয়াই বুঝিবে। কে আমাদের সেই অজ্ঞানাবৃত মানসকুটীরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া আমাদের আপনাদিগকে চিনাইয়া দিলেন। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে একটা সম্মানিত জাতির অন্তর্গত ছিলেন, আমরা যে সম্মানের পাত্র কে আমাদের মনে প্রস্তরাঙ্কের ন্যায় তাহা আঁকিয়া দিলেন? কেই বা আমাদের মনে উচ্চনৈতিক ভাব আনিয়া দিলেন, ইংরাজের কাব্যনাটকাদিতেই না আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে দাঁড় করাইল? অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আলস্যে আমরা অসাড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এতদিন ত আমরা কেবল আহার নিদ্রাদি জীবধর্ম্ম মাত্র পালন করিয়া ইহলোকে আসাযাওয়া করিতেছিলাম। কই,—এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেত আমাদের কেহই একটীবারও আমাদের অতীত তত্ত্ব আলোচনা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কে আমাদিগকে কুপথ ছাড়াইয়া সুপথে আনিল যে আমরা এখন সভ্যভব্য বলিয়া গৌরব করিবার অধিকারী হইয়াছি।

ভাষা ও সাহিত্য। আমরা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যসম্বন্ধে ইংরাজের নিক

যথেষ্ট ঋণী। এদেশে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালাসাহিত্যে বৈষ্ণবকবির পদাবলী ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কতকগুলি কবিতাগ্রন্থ এবং কাশীদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কেতকা দাসের মনসার ভাসান ও কয়েকখানি ধর্ম্মপুরাণ ব্যতীত অন্য পুস্তক অতি অল্পই ছিল। এজন্য বলিতে পারা যায় যে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ছিল, কিন্তু ভাষাকে সংযত করিবার ব্যাকরণ ছিল না, গদ্যসাহিত্যের একবারে অভাব ছিল, বৈষ্ণবধর্ম্মের দুই একখানি গদ্য কড়চা গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া শুনা যায় কিন্তু সাধারণে তাহাদের প্রচলন ছিল না। সকল বিষয়ই কবিতায় লিপিবদ্ধ হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খৃঃ ১৭৮৪ অব্দে হালহেড নামক সিবিলিয়ান সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন, ছাপিবার অক্ষর ছিল না, কাপ্তেন উইলকিন্স সর্ব্বাগ্রে তাহা প্রস্তুত করিয়া শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক একব্যক্তিকে অক্ষর ঢালিবার কৌশল শিখাইয়া দেন, অতএব বাঙ্গালীর মধ্যে পঞ্চাননই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় ছাপিবার অক্ষর প্রস্তুতকারক। আর কেরি সাহেবই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা গদ্য রচনা করেন, তাঁহার অনুবাদিত বাইবেলের নূতন সন্দর্ভই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষার গদ্য গ্রন্থ। রেভঃ লং সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য, বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা হইলেও উহার প্রথম গঠন ইংরাজের হাতে। অতএব বঙ্গভাষার জন্য আমরা যে ইংরাজের নিকট ঋণী সে পক্ষে সন্দেহ নাই। আমরা যে দিকে যে কোন কল্যাণকর ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহাতেই ইংরাজের উদারতা প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হই। আজি ভারতের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই ইংরাজ ভারতের একেশ্বর। তাহা না হইলে আরও কত কাল আমাদিগকে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া বনচারী অসভ্যের ন্যায় কাল কাটাইতে হইত। ইংরাজের কল্যাণেই আমাদের আত্মজ্ঞান ও আত্মসম্মান জন্মিয়াছে। আমাদের জাতীয় ভাষা শ্রীসম্পদসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরাজী ধরণে রচিত হইতেছে। কাব্য নাটকাদিতে ইংরাজীর অনুকরণ চলিতেছে। ভাষা অভিনব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। ইংরাজী গণিত, ইংরাজী [illegible] সাহায্যে গ্রহ উপগ্রহাদির গতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গণনা করা হইতেছে। [illegible] চতুর্দশপদী আমাদের জাতীয় সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইংরাজের রসায়ন শাস্ত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। ইংরাজের শিল্পশাস্ত্রানুসারে আমাদের শিল্পশাস্ত্র প্রণীত হইতেছে। ইংরাজী বিজ্ঞান বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। আর কত বলিব, আমাদের প্রাচীন

সংস্কৃত শাস্ত্রে যাহা ছিল, তাহা সাধারণের দৃষ্টিপথের অন্তরালগত ছিল; ইংরাজের কৃপাতেই তাহার সাধারণ্যে প্রচারিত হইতেছে। ইংরাজের বাইবেলের দেখাদেখি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনস্বীগণ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য রচনার গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের ভাষায় মাজাঘসার আরম্ভ হইল, পরে প্যারীচাঁদ মিত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহাত্মগণ ভাষা পারিপাট্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মহাশয়েরা যথেষ্ট পোষকতা করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে টেকচাঁদ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র ললিত লাবণ্যের সংযোগ করিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে দেখিতে দেখিতে বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে বাঙ্গালার সাহিত্যসম্পদ বাড়িয়া উঠিল। সাহিত্য-ভাণ্ডার পূরিয়া গেল। বৈভবে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যের অনেক উপরে উঠিয়া বসিল। ভারতের কোন প্রাদেশিক ভাষাই আজি ইহার সমকক্ষতা করিতে সমর্থ নহে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক গৌরবের কথা কি আছে। ইহাও যে ইংরাজের প্রসাদে তাহা কে না স্বীকার করিবে। ইতিপূর্ব্বে পারস্য উর্দ্দু ভাষা এ দেশের রাজভাষা ছিল বলিয়া অনেক হিন্দু জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহা শিক্ষা করিতেন, ঐ সকল ভাষায় গদ্য গ্রন্থ অনেক ছিল, কিন্তু আমাদের জাতীয় সাহিত্যে তাহা খুঁজিয়া পাই নাই। অতএব বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে আমরা ইংরাজের নিকট গদ্য লিখিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গালীর যেকোন বিষয়ের উন্নতি তাহা সমস্তই ইংরাজের অনুগ্রহে, ইংরাজের চেষ্টা ও যত্ন ব্যতিরেকে এ দেশের কোন সাধারণ হিতকর কাজ হয় না, হইবার নহে,। ভারতে ইংরাজের কৃপা না হইলে আমাদের উদ্ধারসাধন হইত না এবং ভারতীয় আর্য্য- ঋষিগণের কীর্ত্তিকলাপ বিস্মৃতির ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত। কস্মিনকালে কেহ তাহা লোকলোচনে আনিতে পারিত কি না সন্দেহ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনীর উদ্ধার জন্য ইংরাজ কত অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন।* কত পাশ্চাত্য পৌরাণিকের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে। এরূপ মঙ্গলময় ইংরাজ রাজত্বের কল্যাণ কামনা যে না করে, তাহাকে পাষণ্ড ও ঈশ্বর-বিড়ম্বিত ব্যক্তি বই আর কি বলা যাইতে পারে। ইহসংসার হইতে সেরূপ লোকের অস্তিত্ব যত শীঘ্র লুপ্ত

* Asiatic Society of Bengal.

হয় ততই মঙ্গল। আমাদের শাস্ত্রে আছে,—"কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিষ্কৃতি নাই।"

সমাজ-সংস্কার ও নিষ্ঠুরতা নিবারণ। ইংরাজরাজ তাঁহার ভারতীয় প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না, করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহাতে প্রজার মনঃপীড়া জন্মিতে পারে। ধর্ম্ম মনুষ্যের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তিগত মর্ম্মে আঘাত করা হয়, ইহা বুঝিয়া তাহাতে রাজা চির উদাসীন। কিন্তু সমাজ মধ্যে যে সকল কুপ্রথা আছে, যাহা দ্বারা সমাজের অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে, সমাজের অকল্যাণ ঘটিতে পারে বা সমাজের নিন্দা জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহা সমুৎপাটিত করিতে ইংরাজ নিশ্চেষ্ট নহেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের রাজপুতদিগের কন্যার বিবাহে বহু অর্থব্যয় করিতে হইত, সেই দুর্ব্বহ কন্যাভার হইতে উদ্ধার লাভার্থ তাঁহারা বড়ই নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন। কন্যা জন্মিলে সূতিকাগৃহে বা দুই এক মাসের মধ্যেই বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণ-সংহার করিতেন, তাহা ইংরাজ রাজের দৃষ্টিগোচর হইলে তন্নিবারণার্থ রাজবিধি প্রণীত হইল। তাহাতে কঠোর দণ্ডাজ্ঞার ব্যবস্থা হওয়ায় ক্রমে তাহা নিবারিত হইয়াছে। ইহাতে কত বালিকা অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

এ দেশের স্ত্রীলোকেরা অধিক বয়স পর্য্যন্ত গর্ভবতী না হইলে তখন তাঁহারা গঙ্গাদেবীর নিকট মানৎ করিতেন, পুত্রকন্যা জন্মিলে একটী তাঁহাকে দিবেন, দেবতাকে মানৎ করিয়া তাহা না পালন করিলে পাপাশঙ্কায় জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যা গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে হইত। কি নৃশংস ব্যাপার! কি নিষ্ঠুর আচরণ! ইংরাজ আইন করিয়া তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখন আর সে কুপ্রথা প্রচলিত নাই। ইহা দ্বারা কত শিশুর জীবন রক্ষা হইতেছে! তজ্জন্য ইংরাজকে শত সহস্র বার ধন্যবাদ দিব, না দিলে আমরা ঈশ্বরের নিকট অবশ্যই অপরাধী।

আমাদের কুলাঙ্গনাগণ পতিবিয়োগে তাঁহার শব বা তাঁহার কোন প্রিয়বস্তু সঙ্গে লইয়া জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূতা হইতেন। ইহাতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক সুস্থদেহে প্রাণ হারাইতেন। তন্নিবারণার্থে ইংরাজ আমাদের সহায় হয়েন, ও রাজা রামমোহন রায় এদেশের অনেক সম্ভ্রান্তলোকের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মানুসারে সতীদাহ নিবারণ জন্য এদেশে আইন জারি হয়। সেই অবধি সতীদাহ রহিত হইয়াছে। এই সকল কদাচার নিবারণ করিয়া ইংরাজ আমাদের অশেষ উপকার করিয়াছেন

রাজার জন্য আমাদের যাবতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন করিলেও তাঁহার কৃতোপকারের পরিশোধ হয় না। অতএব কায়মনোবাক্যে রাজার হিতসাধনার্থ প্রাণমন সমর্পণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নয় কি?

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি পর্ব্বোপলক্ষে এদেশের ইতর লোকেরা সন্ন্যাস করিয়া পৃষ্ঠদেশে, অংশে, পার্শ্বে, ললাটে, জিহ্বায় লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া নাচিয়া বেড়াইত, কেহ কেহ চড়ক গাছে উঠিয়া ঘুরিত, পৃষ্ঠের মাংসখণ্ড হয়ত ছিঁড়িয়া যাইলে, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইত। ইহাতেও অনেকের জীবনহানি হইত। প্রজাহিতেচ্ছু রাজা অনুকম্পা করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

শিক্ষা বিস্তার।—ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে এদেশের সাধারণ-শিক্ষা বড়ই হীনবল ছিল। তৎকালে বাঙ্গালাভাষার শৈশবাবস্থা। উচ্চ শিক্ষা সংস্কৃত ভাষাতেই হইত। বাঙ্গালাভাষায় কেবল বর্ণমালার পরিচয় জন্য তাহা লিখিবার ও পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। তজ্জন্য গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গঙ্গার বন্দনা, দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা ও অষ্টোত্তর-শত চাণক্য শ্লোক এবং গণিত শিখিবার জন্য শুভঙ্কর দাসের আর্য্যাই প্রধান অবলম্বন ছিল। এইগুলি শিক্ষা করিয়াই প্রায় সকলে পঠদ্দশার সমাপ্তি করিত। কেহ কেহ সাহিত্যজ্ঞান-সম্পন্ন হইবার জন্য ঘরে বসিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কাশীরাম দাসের মহাভারত, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিত। কেহ বা জমিদার ও মহাজনদিগের সেরেস্তায় কাজ করিবার জন্য ভূমি-পরিমাণ জরিপ এবং জমিদারী ও মহাজনী কাগজ পত্র লিখিতে শিক্ষা করিত। ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও দৈবজ্ঞ সন্তানেরা চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান স্মৃতি, ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জলাদি এবং বৈদ্য সন্তান আয়ুর্ব্বেদ ও দৈবজ্ঞ সন্তান জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতেন।

সকল গ্রামে চতুষ্পাঠী বা পাঠশালা ছিল না। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চ জাতীয়ের সন্তানেরা ও নবশাক শ্রেণীস্থ সকলের নহে, কাহারকাহার সন্তান পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিত। শিক্ষাব দ্বার সকলের পক্ষে সমভাবে উন্মুক্ত ছিল না। কাজেই অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই বিদ্যালাভ ঘটিত। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা সাধ করিয়া কেহ কেহ আপনার পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইত। স্ত্রী-

শিক্ষা একবারে নিষিদ্ধ ছিল, অনেকে বিশ্বাস করিত যে, স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।

এখন সে কাল গিয়াছে—গ্রামে গ্রামে, এমন কি পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, অনেক গ্রামেই চতুষ্পাঠী বসিয়াছে, অধ্যাপক মহাশয় সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্মৃতি ন্যায় শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা করিতেছেন, এই সকল পাঠশালা ও চতুষ্পাঠীতে ইংরাজ-রাজ অর্থ সাহায্য করিতেছেন। দুই চারিখানি গ্রাম লইয়া এক একটী গ্রামে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল বসিয়াছে, নগরে নগরে উচ্চ-শ্রেণীর স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,মহানগরী কলিকাতায় উচ্চ অঙ্গের সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কালেজ চিকিৎসা-শাস্ত্র শিখাইবার জন্য মেডিকেল কালেজ, মেডিকেল স্কুল, স্থপতি, শিল্প ও পূর্ত্ত কার্য্য শিক্ষার জন্য শিবপুরে ও অন্যান্য স্থানে এঞ্জিনিয়ারিং কালেজ, টেক্‌নিকেল স্কুল ও আর্টস্কুল খুলিয়াছে, কোথাও কোথাও কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য কৃষিকালেজ, তাঁত বুনন শিখিবার জন্য বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষায় সকলের সমান অধিকার জন্মিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ও প্রতিযোগিতায় বিদ্যার্থীগণকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভদ্রাভদ্র সকলেই আশা মিটাইয়া লেখাপড়া শিখিতেছে, দরিদ্র কুটীরে, রাজ প্রাসাদে সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যালোক বিকীর্ণ হইতেছে। অজ্ঞানান্ধকার ঘুচিয়াছে, কোথাও তাহার ঝাপসা পর্য্যন্ত নাই। যে সে ব্যক্তি আজি বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি উচ্চ উপাধি লাভ করিতেছে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ন্যায়ভূষণ বিদ্যাভূষণ হইতেছে, মহাকবির আসন পাইতেছে, গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছে, ব্যবস্থাদাতা হইতেছে। বিদ্যার এক চেটেত্ব ঘুচিয়াছে। কাহার কল্যাণে এরূপ সুবিধা সুযোগ ঘটিয়াছে, কে এরূপ মুক্তহস্তে বিদ্যাদান করিতে পারিয়াছে? অমূল্য বিদ্যাধন দান করিতে কাহার এরূপ কৃপণতা নাই? ইংরাজ রাজের—অতএব আমরা ইংরাজের নিকট অনির্ব্বাচ্য ঋণে আবদ্ধ। হিন্দু চিরদিন কৃতজ্ঞ। হিন্দু সন্তানের কৃতজ্ঞতাখ্যাতি দিগন্ত-বিশ্রুত। এমন সুনাম সুখ্যাতি রক্ষার জন্য সকলেরই প্রাণপন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কে এমন নির্ব্বোধ আছে যে, পিতৃপুরুষের নাম ডুবাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতা।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এদেশের সর্ব্বত্র পথঘাট সুগম ছিল না, গ্রাম হইতে গ্রামান্তর যাইতে বড় বড় মাঠ পার হইতে হইত। সেই

সকল পথে দস্যুভয় ছিল। আইল রাস্তা বই কুত্রাপি বাঁধা রাস্তা ছিল না। কেবল হাওড়া হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, অহল্যা বাইয়ের নাগপুর রোড, ও মহানাদ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত "জামাই জাঙ্গাল" এইমাত্র প্রশস্ত পথ। বর্দ্ধমান জেলায় পুরী রোড, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড আরও দুইএকটী তদ্রূপ রাস্তা ছিল। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় তদ্রূপ সুপ্রশস্ত পথ না থাকিলেও অনেক পড়া-পতিত বড় বড় মাঠ ময়দান ছিল, তাহাদের মৃত্তিকা কঙ্করময়ী বলিয়া যাতায়াতে বিশেষ কষ্ট ছিল না। বর্ষাকালে গ্রামপল্লী ও মাঠ ময়দানগুলি সাধারণতঃ জলে কাদায় পরিপূর্ণ হইত। শীত গ্রীষ্মকালে ধুলায় ভরিয়া যাইত, পথিকদের পথপর্য্যটনে বড়ই কষ্ট হইত। তাহার উপর প্রায় সকল মাঠেই দস্যুতস্করের আড্ডা থাকা প্রযুক্ত সর্ব্বদাই আপদ বিপদের শঙ্কা করিতে হইত। এখন গ্রামে গ্রামে রোডশেসের রাস্তা হইয়াছে, গ্রামান্তর যাইবারও রাস্তার অভাব নাই। নগর হইতে নগরান্তর যাইবার জন্য লৌহবর্ত্ম (রেলপথ) প্রস্তুত হইয়াছে, জলপথে ষ্টিমার যাতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে ধনবানেরা পাল্কী চৌপালা চাপিয়া বহু অর্থব্যয়ে পথকষ্টের পরিহার করিতেন, আজিকালি সাধারণে যৎকিঞ্চিৎ অর্থব্যয়ে তদপেক্ষা অধিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত বহু দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করিতে পারিতেছে। তীর্থযাত্রায় কতই কষ্ট ছিল। পথ এতই দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল ছিল যে, যাত্রাকালে কেহই ফিরিবার আশা না রাখিয়া আপন বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। বিদায় দিবার কালে আত্মীয় স্বজনেরা অশ্রুমোচন করিতেন। পথে বাহির হইয়া পথিককে পায়ে নেকড়া জড়াইতে হইত, না জড়াইলে পা দুইখানি কাটিয়া রক্ত বাহির হইত। এখন যে গয়াক্ষেত্রে যাইতে চব্বিশ ঘণ্টা লাগে না সে গয়াক্ষেত্র পনর ষোল দিনেও যাইতে পারা যাইত না। খোরাকী খরচ কত লাগিত। কতই পথশ্রম সহিতে হইত। তাহার উপর নিত্য নূতন স্থণ্ডিলের অন্ন ভক্ষণ করিয়া উদরাময়ে কত কষ্ট ছিল—কেহ কেহ প্রাণও হারাইত। দস্যুহস্তে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে ও কত লোককে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতে হইত। এখন মনে করিলে পনর দিন মধ্যে সেতুবন্ধ দিয়া দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে সুখ বই দুঃখ অনুভব হয় না। দূরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ লইতে হইলে তথায় বহুব্যয়ে লোক পাঠাইতে হইত, তাহাতে কতই কায়িক কষ্ট ছিল। এখন দুইটী মাত্র পয়সা ব্যয়ে দুইদিন ঊর্দ্ধসংখ্যা চারি পাঁচ দিন মধ্যে ডাকযোগে ভারতের যে কোন স্থানের সংবাদ পাওয়া যায়। আর আটটী গণ্ডা পয়সা খরচ

করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে তারে খবর লওয়া যাইতে পারে। সরকারী ডাক ও টেলিগ্রাফে এতই সুবিধা সাধন করিয়াছে। ঘরে বসিয়া ভারতের সকল স্থান যেন নখদর্পণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এমন সুবিধা ভারতে আর কোন কালে হইয়াছে কি? ইংরাজ রাজত্ব আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতেই ইংরাজ রাজত্বের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ইংরাজ রাজত্বেই হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইংরাজ শিল্পী কাপ্তেন উইলকিন্স সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা অক্ষরের ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া দিয়া শ্রীরামপুরের বাঙ্গালী শিল্পী পঞ্চানন কর্ম্মকারকে তাহা শিখাইয়াছিলেন। কাপ্তেন উইলকিন্সের দ্বারাই বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রচ্ছন্ন ভাবে বহুকাল লোকলোচনের অন্তরালে ছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের কেমন সুখের দিন আসিয়াছে। এতদ্দ্বারা বাঙ্গালা পুস্তক প্রচার, সংবাদ পত্র প্রকাশ প্রভৃতি মহোপকার সাধিত হইতেছে।

সভ্যতা।—ভারত প্রাচীন সভ্য দেশ। ভারতের ষড়্‌দর্শন, ভারতের কাব্যালঙ্কার, ভারতের কলা ও স্থপতি-বিদ্যা, ভারতের শিল্প জগদ্বিখ্যাত। প্রাচীন সভ্যতায় ভারত সর্ব্বাগ্রগণ্য দেশ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে সে সমস্তই প্রায় লয় প্রাপ্ত হইয়া নাম মাত্রে পর্য্য-বসিত হইয়াছিল। আজি ইংরাজ রাজত্বে তাহাদের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। ষড়্‌দর্শনের সমাদর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অশন বসন ও ভূষণের পারিপাট্য জন্মিয়াছে। আপামর সাধারণ সকলেই ভাল খাইতেছে, ভাল পরিতেছে। আলাপ আপ্যায়নে কেহই অনিপুণ নহে। তবে কাহার কাহার মতে, তাহাতে বৈদেশিক ঘ্রাণ পাওয়া যাইতেছে। দেশকাল পাত্রের প্রভাব পরিহার করা সহজ সাধ্য নহে। কালধর্ম্মে যাহা হইবার তাহা না হইয়া থাকিতে পারে না। অনুকরণপ্রিয়তা বড়ই সংক্রামক। কালের সংস্রবত্যাগের যখন উপায় নাই তখন অগত্যা কালধর্ম্ম মহিমা সহ্য করিতে হইলেও সভ্যতার দোষ দেওয়া চলে না। আজিকালি ইংরাজ রাজত্বে যে সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা না বলিয়া থাকা যায় না। তাহাতে প্রকার ভেদ থাকে থাকুক।

কৃষি। ইংরাজরাজত্বে কৃষির উন্নতি হইয়াছে। যেরূপে যেদিক দিয়াই হউক, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই একটী বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলেই হইবে—

ছিয়াত্তর মন্বন্তরের (১৭৭০অব্দের দুর্ভিক্ষের) পর এদেশের এক তৃতীয়াংশ ভূমি অনেক দিন পতিত ছিল. এবং দশশালা বন্দোবস্তের সময় যে সকল জমি খামার পতিত ছিল, আবাদ হইত না, সে সকল জমি উত্থিত হইয়াছে। তখন টাকায় সাত আট মন ধান বিকাইত, প্রত্যেক বিঘায় উৎপন্ন ধান্য ১৪ মন ধরিলে তাহা বিক্রয় করিয়া কৃষক ২৷৷০ টাকা পাইত, আজি পাইতেছে ২৪৷৷০ টাকা। অবশ্য একথা মানিতে হইবে যে রাজকর পূর্ব্বে ছিল বিঘাপ্রতি ২৲ টাকা এখন হইয়াছে, ৪৷৶ টাকা। তাহা বাদ দিলেও কৃষকের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী লাভ দাঁড়াইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে কৃষকের পরিশ্রমের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। বিপক্ষবাদী বলিতে পারেন, কৃষকের বিলাসব্যসনে ব্যয়েরও বৃদ্ধি ঘটিয়াছে কিন্তু তাহার লাঘব করাতো কৃষকের হাত। কৃষক যদি বিলাসব্যসনের দিক দিয়া না যায়, আপনার পিতৃপুরুষদের ন্যায় চালা ঘরে বাস করে, মৃত্তিকার পান ও ভোজন পাত্র ব্যবহার করিয়া কৌপিনধারী হয়, তাহা হইলে তাহারতো সঞ্চয় হয়, অল্প দিনেই ধনেশ্বর হইতে পারে। বিলাসব্যসনের দিকে অগ্রসর হওয়া না হওয়াত তাহার ইচ্ছাধীন। ভাল খাইবার পরিবার জন্যতো কোন রাজ নিয়ম নাই। তবে কেন সে বিলাসী হয়। তাহার জন্য কাহাকেও দোষী করা যাইতে পারে না। সুখদুঃখ মানুষের মনে—একজন কুটীরবাসী দরিদ্র দিনান্তে মুষ্টিমেয় অন্ন গ্রহণে আপনার সুস্থ স্বচ্ছন্দ পুত্রকলত্রাদি লইয়া সুখী—আবার প্রাসাদবাসী নরপতিও চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদিতে সুখী নহে। ধনসঞ্চয়ে যাহারা সুখী হইতে চাহে তাহাদের বিলাসব্যসন ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যে সকল কৃষক পিতৃপুরুষের চালচলন রক্ষা করিতে পারিতেছে তাহাদের গৃহ লক্ষ্মীর বিশ্রামাবাস না হইবে কেন।

ধর্ম্মচর্চ্চা। হিন্দুর ধর্ম্মালোচনাতেও আমরা প্রকারান্তরে ইংরাজকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। ইংরাজ ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয়। সত্যের তথ্যানুসন্ধানে ইংরাজ সর্ব্বাগ্রগণ্য। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞানোপদেশের মধ্যে যে সকল সত্য নিহিত আছে, তাহা বুঝিবার জন্য ইংরাজ যতটা ব্যাকুল আমাদের মধ্যে যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলে সেরূপ নহে। বেদোপনিষৎ ষড় দর্শন পুরাণ তন্ত্রাদির তত্ত্বালোচনায় এক একজন ইংরাজ প্রাণমন সমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, একথা আমাদের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। বেদ পুরাণাদি আমাদের মহামূল্য সম্পত্তি, কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশে দুই

একজন মাত্র বেদোপনিষদে কৃতশ্রম দেখিতে পাই। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তাহারও অভাব ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, ভুল ভ্রান্তি মনুষ্য মাত্রেরই সম্ভব—তাহা স্বত্বেও তাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসার ও উদ্যম উৎসাহের জন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহারা আপন ভাষায় বেদের অনুবাদ করিলেন, বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রের উপদেশের সারবত্তা প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহা দেখিয়া আমরা উদাসীন থাকিতে পারিলাম না। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি আমাদের আধুনিক শিক্ষিতগণের মধ্যে কাহার কাহার আস্থা জন্মিল, অনেকেই তাহার আদর করিতে অভ্যাস করিলেন। ইংরাজ বিশেষ না দেখিয়া কোন বিষয়ে আস্থা স্থাপন করেন না, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন, অতএব ইংরাজ বলিলেন—গঙ্গাজলে কোন প্রকার রোগের জীবাণু নাই, অমনি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে গঙ্গাস্নানের আগ্রহ জন্মিল, এত দিনতো আমরা দেখিয়া আসিতেছিলাম গঙ্গার জল দীর্ঘকাল কোন আধার মধ্যে থাকিলে তাহার বিকৃতি জন্মে না, ইহা দেখিয়াও তো আমাদের আধুনিক শিক্ষিতেরা গঙ্গাজলে স্নান ও গঙ্গাজল পানের পক্ষপাতী হইতে পারেন না। তক্রপান সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে, আবার গোময়ের পূতি কারিতার কথা উঠিয়াছে। কালে তাহারও আদর হইবে, অমাবস্যা পূর্ণিমার রাত্রিতে যে গুরু ভোজন নিষিদ্ধ তাহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকেই তাহা পরিহার করিতেছেন। হিন্দুর সকল কাজেই ধার্ম্মাধর্ম্ম ও পাপ পুণ্যের দোহাই দেওয়া আছে। কালে হয় ত নবনীতে অলাবু ভক্ষণ অস্বাস্থ্যকর ইহাও প্রতিপন্ন হইবে। এই জন্যই বলিতে হইতেছে হিন্দু ধর্ম্মের সত্যানুসন্ধানে ইংরাজ আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। যোগ হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দু ঋষিগণ ইহার উদ্ভাবনকর্ত্তা—কিন্তু আজি আমরা থিওসোফিষ্ট (যোগ ধর্ম্মাবলম্বী) হইয়া ইংরাজের নিকট যোগাভ্যাস শিক্ষা করিতেছি। যেরূপে হউক, যাহাকে দিয়া হউক আমরা যোগাভ্যাসী হইতেছি। ইংরাজ যোগাভ্যাসের (থিওসোফির) পথ না দেখাইলে আমরা এখন যতগুলি থিওসোফিষ্ট হইয়াছি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কি ততগুলি যোগধর্ম্মাবলম্বী হইতাম ?

শিল্প। ভারতের সূক্ষ্ম শিল্প বহুকাল হইতে দেশ বিদেশে সমাদৃত। রোমের বণিকেরা কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র ও কৌষেয় বাস এদেশ হইতে লইয়া গিয়া বহুমূল্যে আপনাদের দেশে বিক্রয় করিতেন। কাশীর স্বর্ণ সূত্র

খচিত বস্ত্র, কাশ্মীরি শালের কত আদর ছিল। সেই সকল শিল্প প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। ইতোপূর্ব্বে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের তাহা ব্যবহার করিবার সঙ্গতি ছিল না। ধনবানেরাই তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন। এখন তাহাদের ব্যবহার বাহুল্য প্রযুক্ত কাটতি বেশী হইয়াছে। আজি কালি আমাদের এণ্ডি মটকা, মানভুমের তসর, বহরমপুরের গরদ, ভাগল পুরের খেশ, তদ্ভিন্ন রাধাকীর্ত্তি পুর বদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের কোমের বাসের কতই রপ্তানি বাড়িয়াছে। কাঞ্চন নগর, বনপাশ, শাশপুর প্রভৃতি স্থানের ছুরি কাঁচি ও অন্যান্য লৌহদ্রব্যের আদর হইয়াছে। খাগড়া, সোণামুখী, দেওয়ানগঞ্জ পাটুলি পাত্রসায়ের প্রভৃতি গ্রামে পিত্তল কাঁসার বাসন প্রভৃত প্রস্তুত হইতেছে। কৃষ্ণনগরের পুত্তল, বীরভূম ইলামবাজারের গালার ফুল ফল প্রস্তুত হইয়া বহু শিল্পজীবীর অন্ন সংস্থান করিয়া দিতেছে। ধন ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের আদর বাড়িতেছে। এই সমস্তই ইংরাজ রাজত্বের ঐশ্বর্য্য।

বাণিজ্য।—"বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী" আর্য্য ঋষির উক্তি। এদেশেই বাণিজ্যোপজীবী বৈশ্যের বাস। অতএব হিন্দু যে বাণিজ্য করিতে জানিত ইহাই তাহার প্রমাণ। পুরাণেতিহাসে এদেশের লোকের বাণিজ্য-যাত্রার উল্লেখ আছে। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর বাণিজ্য ব্যবসায়ের কোন লক্ষণই ছিল না। তৎকালে বাঙ্গালীকে সকলেই বাণিজ্য-বৈমুখ বলিয়া জানিত। বঙ্গবাসী আলস্যে অবসন্ন ছিল। মুদিগিরিতেই আমাদের বাণিজ্যবৃত্তি চরিতার্থ হইত। অর্ণবপোতারোহণে বাণিজ্যযাত্রা দূরের কথা, বঙ্গোপসাগরের দিকে দৃষ্টিপাতে হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইত। বাঙ্গালীর বণিকবৃত্তির পরিচয় নামে যতটা পাওয়া যায়, কাজে ততটা নহে—গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিকেরা ঘরে বসিয়াই পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেন, সুতরাং ব্যবসায়ের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিত না। এদেশে যত জাতি বিদেশ হইতে বাণিজ্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইংরাজকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়। তাঁহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়া এদেশে ঐশ্বর্য্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। ইংরাজের সংস্রবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া এবং ইংরাজের অনুকরণ প্রয়াসী হইয়া এদেশের কয়েক জন লোক সার্থক হইয়াছেন। সেরূপ অনুকারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠিল কই। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতিগতি কিন্তু ভিন্ন পথে ধাবিত হইল, বাঙ্গালী অলসতায় হৃৎপাপঙ্ক

করিল। বাণিজ্য ব্যবসায়ের দিক দিয়া গেল না। যেমন রামগোপাল ঘোষ, শিবকৃষ্ণ দাঁ, তারক নাথ সরকার প্রভৃতি মনিষীগণ ইংরাজের অনুকরণ দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া ধনশালিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—তৎকালে আর কেহ তেমন করিতে পারিল কই। চাকরীর উত্তেজনাই বাঙ্গালীকে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল, এখন তাহার যৎসামান্য অবসাদে বাঙ্গালীর বাণিজ্যপ্রবৃত্তি নানা উপায়ে ইংরাজ জাগ্রত করিয়া দিতেছেন।

বাণিজ্যে দেশের ধন বৃদ্ধি হইয়াছে। টাকা সুলভ হইয়াছে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে। তাহাতেই কৃষিশিল্পের অবস্থা ফিরিয়াছে, মজুরি করিয়া মজুরেরাও মাসিক ছয় আট আনা বেতনের স্থলে সাত, আট, দশটাকা বেতন পাইতেছে। নিরক্ষর ভদ্র সন্তানেও ডকে ও কল কারখানায় কাজ করিয়া আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহের সুযোগ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে বাণিজ্য ব্যবসায় অনেকের মন ঝুঁকিয়াছে। ইংরাজ রাজ অনেক দিন হইতে আমাদিগকে কৃষি শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, বাণিজ্য ব্যবসায়ে স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনের প্রবৃত্তি দিয়া আসিতেছেন। কৃষিকালেজ ও শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপন তাহার দৃষ্টান্ত। গবর্ণমেণ্টের আফিসে আদালতে অনেকদিন হইতে দেশীয় শিল্প দ্রব্যের ব্যবহার চলিতেছে ইংরাজ যে আমাদের শুভানুধ্যায়ী সে পক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

—— •:•:• ——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের উপযোগিতা।—খৃষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দী পৃথিবীর ইতিহাসে উন্নতির যুগ বলিয়া কথিত। এই শতাব্দীর আরম্ভ হইতে ভূমণ্ডলের সমস্ত জাতি অল্পাধিক উন্নতির দিকে অগ্রসর। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির উন্নতি, ধনের উন্নতি, ধর্ম্মকর্ম্মের উন্নতি, সভ্যতাভব্যতার উন্নতি, সংক্ষেপতঃ সকল বিষয়েরই উন্নতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই উন্নতির জন্য লালায়িত দেখিতে পাইবে। এসময় ইংরাজ রাজের কৃপা না হইলে, ইংরাজ আমাদের উন্নতির জন্য অগ্রসর না হইলে আজিও আমরা কোল ভীলাদি অসভ্য জাতির কিছু উপরে থাকিতাম মাত্র।

সভ্যতার সুন্দর আলোক দেখিবার অধিকারী হইতাম না। ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে অধঃপতনের দিকে যতটা অগ্রসর হইয়াছিলাম ও হইতেছিলাম তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার যাহা কিছু ছিল তাহাও হারাইয়া বসিতাম। এই জন্যই বলিতে হইতেছে যে, ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব আসিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছিল। এ সময় ইংরাজের ন্যায় সুসভ্য, ধর্ম্মনিষ্ঠ সৎ জাতির হাতে ভারতের শাসনদণ্ড ন্যস্ত না হইলে আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইত তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। অতএব উপযুক্ত সময়েই ভারত ইংরাজের অধীন হইয়াছে। সময়ের প্রাধান্য সকলকেই মানিতে হয়, সেই সময় বশেই ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব। ইহাকে ভারতবাসীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এখন সকলেরই ইংরাজ-শাসনের কৃপাদৃষ্টি বাঞ্ছনীয়। আমরা অদ্যাপি আত্ম-রক্ষায় সমর্থ নহি, আপনাদের হিতাহিত ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় মহাশক্তিশালী ইংরাজরাজের অনুগত ও আশ্রিত থাকা আমাদের সর্ব্বোতোভাবে শ্রেয়ঃ।

কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কাহাঁর নিকট কোন উপকার পাইলে আপনা হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে মন আকৃষ্ট হয়, তাহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না। আপনা হইতেই মুখ হইতে সাধুবাদ নির্গত হয়, সুযোগ ও সুবিধা ঘটিলে জ্ঞানবানে তাহার প্রতিশোধ দিবার ত্রুটী করেন না। কেহ কোন ইতর জন্তু পুষিলে সেও পোষণকর্ত্তার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলে। কৃতজ্ঞতাহীন হৃদয় মরুভূমির ন্যায়। উপকারীর উপকার স্বীকার না করা মহাপাপ। তাহাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিষ্কৃতি নাই, ইহা আমাদের শাস্ত্রবাক্য। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদ গুলিতে দেখান গিয়াছে—আমরা কত রকমে ইংরাজ-রাজের নিকট উপকৃত। যতদিন আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনই ইংরাজের উপকার স্বীকার করিতে হইবে; না করিলে আমরা লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ, পতিত জাতি বলিয়া জগদ্বাসীর অবজ্ঞাভাজন হইব। জ্ঞানী হইয়া কে সেই কুনাম কুখ্যাতি গ্রহণ করিয়া কলঙ্কের পসরা মাথায় লইতে প্রস্তুত হইবে; অতএব ইংরাজের কৃতোপকারের জন্য আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। চিরদিন আমরা ইংরাজ রাজত্বের কল্যাণ কামনা করিব।

রাজভক্তি। আমরা হিন্দুসন্তান—হিন্দু। হিন্দুর জীবন ধর্ম্মানুগত। ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশানুসারে আমরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, আত্মীয়-স্বজনের সহিত আত্মীয়তা করি, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করি, ভৃত্যাদি ও অনুগত জনের প্রতি সদ্ব্যবহার করি। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের ক্রিয়াকলাপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলই হিন্দুশাস্ত্রানুসারী। হিন্দুশাস্ত্রের নিদেশানুসারে আমরা রাজভক্তি-পরায়ণ। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজশক্তির সম্মান করিয়া আসিতেছি বলিয়া, আমাদের রাজভক্তির সুখ্যাতি আছে। আমরা রাজাকে দেবাংশ-সম্ভূত দেবতা বলিয়া জানি। শাস্ত্রকারেরা বলেন, "জগৎ বিশৃঙ্খল হইলে সকলেই ভয়ে আকুল হয়, এজন্য চরাচর রক্ষার্থ পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, অগ্নি, সূর্য্য, কুবের এই অষ্ট দিক্‌পালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণের অংশ হইতে রাজা নির্ম্মিত হইয়াছেন বলিয়া, তেজের আতিশয্য হেতু, তিনি সকল প্রাণীকেই অতিক্রম করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে কোন লোকই রাজাকে অভিমুখে অবলোকন করিতে সক্ষম নহে। প্রভাবে রাজা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের বরুণ এবং মহেন্দ্রের তুল্য। রাজা বালক হইলেও সামান্য মনুষ্য বোধে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। অসাবধান হইয়া যে ব্যক্তি অগ্নির নিকটস্থ হয়, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন, পরন্তু রাজার কোপাগ্নিতে পতিত হইলে, সপরিবার, পশু ও দ্রব্যসমষ্টির সহিত নষ্ট হইতে হয়। প্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ স্বকীয় শক্তি এবং দেশকালের পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা রাজধর্ম্মানুরোধে সকল প্রকার রূপই ধারণ করিয়া থাকেন। যিনি প্রসন্ন হইয়া থাকিলে মহতী শ্রীলাভ হয়, যাঁহার পরাক্রমপ্রভাবে বিজয় লাভ হয়, যাঁহার ক্রোধ মৃত্যুর বসতিস্থল, নিশ্চিত তিনিই সর্ব্বতেজোময়। যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ তাঁহাকে দ্বেষ করিয়া থাকে, সে নিশ্চিতই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য রাজা সত্বর মনোযোগী হয়েন। অতএব রাজা দুষ্টদমন ও শিষ্টপা[illegible] ধর্ম্মনিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করা উচিত [illegible]

[illegible]মততেজা রাজগণ অগ্নি, ঈশ, চন্দ্র, যম ও বরুণদেবের মূর্ত্তি স্বরূপ। এজন্য রাজগণের প্রতি হিংসা আক্রোশ বা অবজ্ঞাবাক্য ব্যবহার করা কাহারও কর্ত্তব্য

* মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায় ৩—১২ শ্লোক।

নহে। দেবগণই ভূপতিরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিধাতা ইন্দ্র হইতে প্রভুত্ব, বহ্নি হইতে প্রতাপ, যম হইতে ক্রোধ, চন্দ্র হইতে সৌন্দর্য্য, কুবের হইতে ধন এবং ভগবান বিষ্ণু হইতে মধুর সত্বগুণ লইয়া নৃপতিগণের শরীর সৃজন করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলে রাজগণ ইন্দ্র সদৃশ জানিবে, অতএব; ভূপতিগণ ইন্দ্র হইতে বিভিন্ন নহেন।"*

আমাদের ভারতসম্রাজ্যের অধীশ্বর ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন। যাঁহারা এ দেশে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যশাসন করেন, তাঁহারা সম্রাটের ন্যায় আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইবার অধিকারী। তাঁহাদিগকে সম্রাটের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হিন্দু হইয়া, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া আমরা হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ বাক্য অবনত মস্তকে মানিতে এবং তদনুবর্ত্তী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সর্ব্বতোভাবে বাধ্য। যিনি তাহা না করেন, তিনি হিন্দুসমাজের আবর্জ্জনা বই আর কিছুই নহেন। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে আপনার বলিতে বাধ্য নহেন। শাস্ত্রোপদেশ পালন হিন্দুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "রাজা প্রসন্ন হইলে শ্রীসৌভাগ্য,সুখসম্পদ সমস্তই আয়ত্তাধীন হয়, সংসারী মাত্রেরই তাহা বাঞ্ছনীয়, রাজসেবায় ধর্ম্ম আছে, শ্রীসৌভাগ্য আছে। নরজন্মধারণে মনুষ্য আর কি কামনা করিতে পারে। অতএব রাজানুবর্ত্তী হইয়া শিষ্টশান্তভাবে কালযাপন করিতে পারিলেই, যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সহজেই রাজানুগৃহীত হইয়া, ঐহিক সুখ এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা দ্বারা পরকালে সুখী হইবার সুযোগসত্বে, তাহা অবহেলা করে সে নির্ব্বোধ। রাজা আমাদিগকে রক্ষা করেন, অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করেন, এবং আমাদের সুখশান্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দতায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদের সুশিক্ষার আয়োজন অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমাদের অশান্তি দূর করণার্থ তিনি পুলীশ রাখিয়াছেন, আদালত সংস্থাপিত করিয়া আমাদের হাতেই বিচারের ভার দিয়াছেন। যদি আমরা রাজবিধির অপলাপ করি, তাহার জন্য রাজা দোষী হইতে পারেন না। অনেকস্থলে আমাদের আপনাদের দোষ আমরা আপনারা দেখিতে না পাইয়া বিড়ম্বিত হই, মহামহিমান্বিত ভারতেশ্বর প্রত্যাশা করেন, আমরা তাঁহার এই সুবিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্য শাসনে তাঁহাকে সহায়তা করিব। এরূপ

* বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ৩য় অধ্যায় ৬—৯ শ্লোক।

সম্রাটের সাম্রাজ্যে বাস করিয়া আমাদের কিসের দুঃখ? আমরা আপনারা শিষ্ট শান্ত, রাজভক্ত হইতে পারিলেই সুখী। আজি অশীতিপর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে, "ইংরাজরাজত্বে অনেক সুখ, অনেক স্বচ্ছন্দতা।"

ইংরাজ-চরিত্র। ঋষিকল্প রাজা রামমোহন রায় আপনার সংক্ষিপ্ত জীবনীমধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, "ইংরাজ রাজত্বের উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল না, আমি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের ভিতরে ও বাহিরে অনেক স্থান বেড়াইয়াছি। যখন আমার বয়স কুড়ি বৎসর, আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং পূর্ব্ববৎ স্নেহযত্ন করিতে থাকেন। বাড়ী আসিয়া আমি ইউরোপীয় সমাজে গতিবিধি করি, তাঁহাদের বিধি ব্যবস্থা ও রাজ্যশাসনপ্রণালী কতকটা অবগত হই, তাহাতে আমার পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হয় এবং তাঁহাদিগকে অধিকতর বুদ্ধিমান, বিবেচক, স্থির ও সংযতচরিত্র দেখিয়া তাঁহাদের পক্ষপাতী হই। বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, বিদেশীয়ের অধীন হইলেও ইংরাজশাসনে শীঘ্রই ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের নিশ্চিত সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। কাজেকর্ম্মে আমি তাঁহাদের অনেকেরই বিশ্বাসভাজন হইতে পারিয়াছিলাম।*

আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইংরাজের সদ্গুণ স্বীকার করেন। ইংরাজ-চরিত্রে প্রশংসাযোগ্য অনেক সদ্গুণ আছে। ইংরাজের উন্নত জাতীয় ভাব ও জাতীয় চরিত্র আছে। যে জাতির শিক্ষাদীক্ষা বা সংস্রবগুণে তজ্জাতীয়

* When I reached the age of twenty, my father recalled me and restored me to his favour, after which I first saw and began to associate with the Europeans, and soon after make myself tolerably acquainted with their laws and form of Government. Fainding them, more intelligent, more steady and moderate in their conduct I gave up my prejudice against them and became inclined in their favour, feeling persuaded that their rule, though a foreign yoke, would lead more speedily and surely to the amieloration of the native inhabitants, and I enjoyed the confidence of several of them even in their public capacity.

Auto-Biography of Raja Kam Mohan Roy,

সকলেরই পরস্পর ব্যবহারগত সামঞ্জস্য থাকে তাহাকেই জাতীয় চরিত্র বলে। দশ জন দশ রকমের হইলে তাহাদের চরিত্রে জাতীয়তা থাকে না। ইংরাজ-চরিত্রে আমরা সুস্পষ্ট জাতীয়তা দেখিতে পাই ; এস্থলে দুই একটি উদাহরণ দিব।

আমাদের একজন সুযোগ্য বন্ধু একবার বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার কোন একটি যাদুঘর দেখিবার ইচ্ছা হয়। তজ্জন্য তিনি পথে বাহির হইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, গন্তব্যপথ তাঁহার জানা ছিল না, কাজেই একজন বিলাতী শ্রামিককে সম্মুখে পাইয়া, তাহাকে যাদুঘরের পথ জিজ্ঞাসা করেন, শ্রামিক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এক মাইলেরও বেশী পথ গেল, এবং বিদেশীয় পথিককে যাদুঘর দেখাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলে, বন্ধুবর বিস্মিতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাকে পথ দেখাই-বার জন্যই এতটা পথ আসিলে ?"

শ্রামিক উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ—যেখানে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সেখান হইতে আমার কর্ম্মস্থান এতটাই হইবে। আপনি একজন বিদেশবাসী হইয়া আমাদের দেশের যাদুঘর দেখিবেন সেত আমার গৌরবের কথা আপনাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।"

বন্ধুবর পুনরায় বলিলেন, "তোমার এই বিলম্বের জন্যত খুব ক্ষতি হইল। তোমাব প্রভু হয়ত রাগ করিবেন।"

শ্রামিক বলিল, "আমাব প্রভু আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

ধন্য দেশ—ধন্য প্রভু—ধন্য ভৃত্য! ইহাকেই বলে প্রকৃত স্বদেশপ্রীতি। আমাদের দেশে আমরা এরূপস্থলে কি করিয়া থাকি ? তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই আপনাপন মনে বুঝিয়া দেখিলে তাহা জানিতে পারিবেন। ঐ ইংরাজ শ্রমিক হয় ত লেখাপড়া জানিত না, কিন্তু সংস্রবগুণে তাহার চরিত্রে এই মহত্বটুকু জন্মিয়াছিল। ইহাকেই বলে জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ।

বিলাতে গরীবদের পড়িবার জন্য "পেণি লাইব্রেরী" আছে। একটী পেণি-সেই পুস্তকালয়ে দিয়া যে কেহ যে কোন বহি ইচ্ছা পড়িতে লইয়া যাইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট সময় শেষে তাহা ফিরাইয়া দিতে হয়। সেই যাত্রাতেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধু ঐরূপ একটী পুস্তকাগারে গিয়া সেখানকার কার্য্যপ্রণালী দেখিতে-ছিলেন। এমন সময়ে এক জন গরীব লোক আসিয়া একটী পেণি দিয়া পুস্তকা-

লয়ের অধ্যক্ষের নিকট একখানি এক পাউণ্ড মূল্যের পুস্তক লইয়া গেল। পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ তখন তাহার নামধাম লিখিয়া লইলেন, দেখিয়া আমাদের ভারতবাসীবন্ধু পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ব্যক্তি কি আপনাদের পরিচিত?"

পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ বলিলেন, "না, আমাদের কাহারও পরিচিত নহে।" বন্ধু বলিলেন, "তবেত সে অনায়াসেই পুস্তকখানি আত্মসাৎ করিতে পারে?"
উত্তর। তা কেন করিবে, উপকৃত হইয়া কি কেহ প্রতারণা করিতে পারে?

এইবার আমাদের ভারতবাসী বন্ধু বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইলেন, তাঁহার মুখে আর কথাটি নাই। উপকৃত হইয়া যে প্রবঞ্চনা করিতে নাই, তাহা বিলাতের সামান্য শ্রমিকেও জানে। বিলাতের নৈতিক উন্নতি কত অধিক। অতএব বিলাতবাসীর নিকট আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে শিখিবার আছে। এক কালে এদেশের লোকেরও যথেষ্ট নীতিজ্ঞান ছিল, এখনও পল্লীগ্রামের অনেক চাষা-ভুষার নিকট এরূপ শিক্ষা অনেক পাওয়া যায়। এখন তাহারা গো-বেচারা বা ভাল মানুষ বলিয়া অভিহিত, অর্থাৎ তাহারা সাদাসিধা লোক। আমরা ভাল ভাল পোষাক পরিচ্ছদ, চস্‌মা, চুরুট ইত্যাদি ব্যবহারে পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণ শিক্ষা করি, সৌখীন হইতে চেষ্টা করি, তাঁহাদের সদাচার, সচ্চরিত্রার দিক্‌ দিয়া যাই না, সে দোষ কাহার? ইংরাজ চরিত্রে উচ্চতা অনেক, যে জাতি যত উন্নত সে জাতির চরিত্র তত উন্নত হয়, যাঁহারা ইংরাজ জাতির সহিত মিলিবার মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই ইংরাজের জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

কৃষক বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী হইলে, সে কিরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতায় কালযাপন করিয়া সময়ে দশটাকা সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা একজন কৃষকের আয়ব্যয়ের হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এক কৃষকের পরিবারে সে আপনি, পত্নী, দুইটী শিশু সন্তান, বৃদ্ধা মাতা ও একটী বিধবা ভগ্নি আছে। তাহার দশ বিঘা শালি ও ৪/ বিঘা শুনা জমির একটী জোত, তাহার বার্ষিক খাজনা ৫৬৲ টাকা।

জমা		খরচ	
সন ১৩১৬ সাল তাং ২রা বৈশাখ।		সন ১৩১৬ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ	
মহাজন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের		লাঙ্গল খরিদ বাবত	১৷৷০
নিকট ২টী বলদ খরিদ জন্য কর্জ্জ	৮০৲	২/মন বীজ ধান খরিদ	৩৷৷০
সন মজকুরার ১০ই জ্যৈষ্ঠ।		২১শে আষাঢ—আষাঢ় কিস্তির খাজনা	
উক্ত রায় মহাশয়েব নিকট		বাবত ১৪৲, শেশ ৸৵০	১৪৸৵০
আবাদ খরচ ও সংসারখরচ		১৫ই আশ্বিন—আশ্বিন কিস্তির খাজনা	
বাবদ কর্জ্জ	৯০৲	বাবত ১৪৲, শেশ ৸৵	১৪৸৵০
ঐ সন ১৬ই আষাঢ়		ঐ রোজ	
উক্ত রায় মহাশয়ের নিকট		ভৃত্যেব বেতন ৬মাসের কাথ	২০৲
আষাঢ় কিস্তিব খাজন বাবতকর্জ্জ	১৫৲	ঐ রোজ—	
৫ই অগ্রহায়ণ		আলুবীজ বিঘাপ্রতি ৪/ মন হিঃ	
৪/ বিঘা শুনা জমিব উৎপন্ন		১৬/ মনেব মূল্য ৭৲ হিঃ	১১২৲
পাট বিক্রয় বিঘা প্রতি ৬/ মন		সার খরিদ বিঘা প্রতি ১৲ হিঃ	১০৲
হিঃ ২৪/মন পাটের মূল্য		২৫শে আশ্বিন	
৬৲ টাকা মন হিসাবে	১৪৪৲	৪/ বিঘা শুনা জমিতে আলু আবাদ	
৪/ বিঘা শুনা জমির উৎপন্ন আলু		জন্য বিঘাপ্রতি ৪/মন হিঃ ১৬/ মন	
প্রতি বিঘা ৭০/ মন হি.		খইলেব মূল্য ২৷৷০ হিঃ	৪০৲
২৮০/মনের মূল্য ২৲ টাকা হিঃ	৫৬০৲*	২৫শে অগ্রহায়ণ	
১০ই ফাল্গুন।		১০/বিঘা শালি জমিতে ধান্য আবাদ	
১০/ বিঘা শালি জমির উৎপন্ন		ধানকাটা ও ধান ঝাড়াই মড়াই খরচ	
ধান্য প্রতিবিঘা ১২/ হিসাবে		বিঘা প্রতি ২৲ হিসাবে	২ ৲
১২০/ মনের মূল্য ১৸০ হিঃ	২১০৲		
মোট	১০৯৯৲		

* কৃষি সমাচাব নামক মাসিক পত্রের ১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যায় আলু-চাষের যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে জমিব খাজানা বিঘা প্রতি ২৲ টাকা ধরা হইয়াছে। সর্ব্বত্র ২৲ টাকা খাজনায় আলুব জমি মিলে না, ৬।৮ টাকা দিতে হয়। জমিতে খইলও সর্ব্বত্র একরূপ দিতে হয় না। নিতান্ত মন্দ জমিতেই ১০/ মন খইল লাগে, উৎপন্ন ফসল বিঘা প্রতি ১১০/ মনও ফলিতে দেখা যায়। কৃষি বিবরণে তাহাই দেখান হইয়াছে।

খরচ

জের	২৩৬৸৵০
২৫শে পৌষ।	
পৌষ কিস্তির	
খাজনা ১৪৲ শেশ ৸৵	১৪৸৵৹০
ভৃত্যের অবশিষ্ট ৬ মাসের বেতন	২০৲
সম্বৎসরের খোরাকী ধান্ত দরুণ	
কৃষক পরিবার ৪ জন ও ভৃত্য	
৫ জনের প্রত্যেকের ১৴ কাহন	
হিসাবে (১৬৴মন) ৮০৴ মনের	
মূল্য ১৸০ হিসাবে	১৪০৲
সম্বৎসরের মৎস্ত	৬৲
নারিকেল তৈল ৴৬সের	২।০
জ্বালানী কেরোসিন তৈল	
মাসিক ৭ বোতল হিসাবে	
৮৪ বোতল ৴১০ আনা হিসাবে	৭৸৵
দেশেলাই মাসিক ৪টা হিঃ	
৪৮ টার মূল্য	।৵০
হাঁড়ী কলসী ইত্যাদি	৩৲
কৃষক পত্নীর চুড়ি ৪ জোড়া	৸০
সিন্দুর	৶০
পান বৎসরে	১॥০
চুণ	৵০
মোট	৩৩৩॥৶

খরচ

জের	৩৩৩॥৶০
শীতকালে সর্ব্বদা গায়ে দিবার জন্য	
আপনার ও ভৃত্যের ১খানি হিঃ	
২খানি বোম্বাই চাদর	১॥০
কৃষকের শিশু ২টির বস্ত্র গড়ে	৬৲
কুটুম্বালয় ও মেলা মহোৎসবে	
যাইবার জন্য কৃষকের	
ভাল ধুতি ১ খানি	১।৵০
উড়ানি এক খানি	৷৷৵০
কামিজ ১টা	১৵০
গেঞ্জি ২টা	১৲
জুতা ১ জোড়া	২॥০
ছাতা ১ টা	১৵০
শীতবস্ত্র হিসাবে গড়ে	
প্রতি বৎসর	৩৲
গরম কোট ১টা গড়ে বৎসরে	১॥০
মহাজনের ঋণ ২০০ টাকা	
* সুদ মাসে গড়ে শতকরা ৩৵০ হিঃ	
বৈশাখ হইতে নাগাইদ আশ্বিন	৩৭॥০
কার্ত্তিক হইতে নাগাইদ পৌষ	
২৩৭॥০ টাকার সুদ	২২।৫
মোট	২৫১৸৫
মোট	৬৫০।৶০

কৈঃ—

জমা——১০৯৯৲

খরচ—— ৬৫০।৶

বাকী—৪৪৮॥৴০

আগামী বর্ষে কৃষকের গোরু, লাঙ্গল, বীজধান কিনিতে হইবে না, তাহার জন্য ৮৫৲ টাকা বাঁচিবে, সম্বৎসরের খোরাকী ধান থাকিবে ; খাজনার জন্য মহাজনের নিকট হাত পাতিতে হইবে না।

* কর্জ্জের টাকা ভিন্ন সময়ে লওয়া হইলেও হিসাবের সুবিধার জন্য বৈশাখ হইতেই সুদের হিসাব দেওয়া গেল।